106

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অশান্ত ক্যাম্পাস ॥ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জনমনে উদ্বেগ

ঢাকা ভার্সিটি আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। হল দখলের অভিযান থেকে শুরু করে দেয়ালে নেতাদের ছবি আঁকা ও তা আবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুছে ফেলা এবং পরিশেষে সকল ছাত্রকে হল থেকে বের করে দিয়ে নতুন করে তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিপত্রের বাস্তবায়ন ঘটে। তবুও কোন কোন ছাত্র সংগঠন এহেন আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চরম গর্হিত অপরাধ করেছে কেউ কেউ বিশেষ করে ভিসির প্রতি ইটপাটকেল, ডিম আর বোতল নিক্ষেপ করে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে। এরপর দুই ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বিবৃতি আর পাল্টাবিবৃতি দিচ্ছেন। সংবাদপত্রে তা ছাপাও হচ্ছে ফলাও করে। আর এতে উত্তেজনা বাড়ছে পরস্পরবিরোধী ছাত্রদের মধ্যে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এমনি অবস্থার উদ্ভব ঘটছে কিছুদিন পর পরই। সকল শাসন আমলেই। এর পরিণতিতে কখনও কখনও মুখোমুখি বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছে। খুন হচ্ছে একই সাথে একাধিক ছাত্র। ক'দিন আগে এমনি ঘটনা ঘটে গেল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। চট্টগ্রাম আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তেজনা এখনও তুঙ্গে।

প্রত্যেক আমলেই সরকারের আদর্শপুষ্ট কিছু কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদের উদ্ভব ঘটে। খালেদা জিয়া, এরশাদ এমন কি তার আগে বাকশালের শাসনামলেও সরকারপন্থী একনিষ্ঠ ভিসি'র অভাব ঘটেনি। আর এই ভিসিদের মোকাবিলা করার জন্য কিছু কিছু ছাত্র সংগঠন মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে। সেই সাথে কিছু সংখ্যক কায়েমী স্বার্থবাদী শিক্ষক এই সরলমতি ছাত্রদের আদর্শের নামে উস্কে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। এই স্বার্থপর-আদর্শহীন শিক্ষক ও ছাত্রনেতাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কতিপয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এমনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে একেকটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ দল। ছাত্র সংগঠন। এরা নিজেরা লেখাপড়া করে না, অন্যকেও করতে দেয় না। আর কিছু সংখ্যক শিক্ষক এদের নেতৃত্ব দিয়ে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। লেখাপড়া করার মতো শান্তিপূর্ণ অবস্থা এখন আর নেই কোথাও। বড় বড় দলের নেতা-নেত্রী, সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের ছেলেমেয়েরা সকলেই লেখাপড়া শিখছে বিদেশে। শুধুমাত্র হতভাগ্য অভিভাবকদের ছেলেমেয়েরাই এখন পড়াশোনা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের অন্য কোন উপায় নেই বলে। ভাগ্যচক্রে তারাই জড়িয়ে পড়ে চক্রান্তকারীদের বেড়াজালে। তারপর এক সময় লাশ হয়ে ফিরে আসে বাবা-মার কাছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তেজনা আর সংঘর্ষের সংবাদে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অভিভাবক মহল সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে! সবার মুখে একই প্রশ্ন, এমনি অবস্থার কি অবসান ঘটবে না কখনও?

রাজনৈতিক আকাশে আবার কালো মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে উৎখাতের আন্দোলন শুরু করেছিল এক সময়ে। আজ সে জামায়াত আর আওয়ামী লীগের সাথে নেই। বিএনপি'র সাথে আবার আন্দোলনের আঁতাত শুরু করেছে। এর মধ্যেই এক দফা হরতাল করেছে বিএনপি আর এক দফা করেছে জামায়াত। সুযোগ খুঁজছে আন্দোলনের।

ক্ষমতায় গেলে সরকার এবং সরকারের উজির-নাজির থেকে শুরু করে নিম্নপদস্থ প্রায় সকল মানুষই হয়ে পড়ে দৃষ্টিহীন আর বধির। অতি কাছের ঘটনাবলী তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়া কোথায় কি হতে পারে, তাও তারা উপলব্ধি করতে পারে না। প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রোশ ও প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য তারা হয়ে ওঠেন উন্মাদ। সহনশীলতা আর ধৈর্যের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতায় থাকাকালে এমনি উন্মাদনার প্রতিফলন ঘটেছিল বিএনপির অনেক কার্যকলাপে। জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের উপর শুরু হয়েছিল ভয়াবহ নির্যাতন। গণতান্ত্রিক শাসনামলেও জাতীয় পার্টির অনেকেই মৌলিক অধিকারটুকু হারিয়ে ফেলেছিলেন। জেল-জুলুম আর নির্যাতন হয়ে উঠেছিল অতি সাধারণ ঘটনা। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। দুর্নীতির মামলা দায়ের করে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল ওদের বিরুদ্ধে। এর ফলে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। বিরোধী দলগুলো প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। সেদিনও বিরোধী দলগুলো গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের হুমকি দিত প্রতিনিয়ত।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। আওয়ামী লীগ আজ ক্ষমতাসীন আর বিরোধী দলের ভূমিকায় বিএনপি। দেড় বছর কাটতে চলল। অতীত সরকারের উন্মত্ত কর্মকাণ্ডকে লক্ষ্য করেই আওয়ামী লীগ সরকার তাদের অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছে। ক'দিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে কারাবন্দীদের যে হিসাব দিয়েছেন তা থেকেই এ সত্য প্রকট হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হচ্ছে মিথ্যা মামলা।

দেশের সংবাদপত্রগুলোর দিকে তাকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে। হত্যা, খুন, সংঘর্ষ, ধর্ষণ যেন দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। মানুষের জানমালের বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। নেই মন্ত্রিত্ব সরকারী কর্মকর্তা আর দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের তৎপরতা। হাইজ্যাক, রাহাজানি হচ্ছে প্রকাশ্য রাজপথে সর্বসম্মুখে। শিশু জিম্মি রেখে টাকা আদায় করা হচ্ছে। বিভিন্ন পালাপার্বণ আর রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের নামে জোর করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি থেকে। কেউ দিতে না পারলে তার জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ।

ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প-কারখানা বন্ধ হচ্ছে একে একে। বেকারত্বের যন্ত্রণায় তরুণ সমাজ আজ বিভ্রান্ত। এটাই হচ্ছে আজ এদেশের প্রকৃত চিত্র। সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থা। এ অবস্থার অবনতি ঘটছে, না পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে তা কি সরকারী কর্মকর্তারা খতিয়ে দেখছেন? দু'চারজন দলীয় নেতা-কর্মীর অবস্থা উন্নতি দেখে দেশের সাধারণ মানুষের উন্নতি হচ্ছে এ কথা বলা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃত পক্ষে সরকার কি আদৌ এই সাধারণ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে?

বরং কোন কোন প্রভাবশালী নেতা-নেত্রীর কর্মকাণ্ড আর দায়িত্বহীন উক্তির জন্য পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে কোথাও কোথাও। কদিন আগে এক প্রতিমন্ত্রীর অবৈধ বিদেশ সফরকে কেন্দ্র করে সারাদেশে সৃষ্টি হলো হুলস্থূল কাণ্ড। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগল নানা ধরনের গোপন তথ্য। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাধ্য হয়েই তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। কিন্তু সাত দিনেও প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণের ঘোষণা এলো না। সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক পন্থায় ও নিয়মনীতি বহির্ভূতভাবে প্রধানমন্ত্রী নিজেই ২৩ দিন বিদেশে ছুটি কাটিয়ে এলেন। এ সফরকালে তাঁর সাথে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বাহিনীসহ সমগ্র প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়। অথচ তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কাজ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নানা ধরনের নির্দেশ দিয়েছেন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের। প্রয়োজনীয় ব্যয় হয়েছে বিভিন্ন খাতে। সাংবিধানিকভাবে এইসব কর্মকাণ্ডের বৈধতা কতটুকু? এইসব অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই আন্দোলনের হাতিয়ার তুলে দেয়া হচ্ছে বিরোধী দলের হাতে। অবৈধ এইসব কর্মকাণ্ড মোকাবিলার জন্যই কেউ কেউ সরকার উৎখাতের হুমকিও দিচ্ছেন অবৈধভাবে। আমরা কখনই অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে সমর্থন দেইনি। হুমকি বা উৎখাতের মতো অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপকেও প্রশ্রয় দিতে পারি না। উৎখাতের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের পতন ঘটতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সাংবিধানিক পন্থা। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে গণরায়। তাই মন্ত্রী ও নেতাদের প্রতি আবেদন, গণতান্ত্রিক রায়কে স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডে পরিণত হতে দেবেন না। বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের প্রতি আহ্বান, আর হুমকি-ধমকি ও উৎখাতের কথা বলবেন না। স্বৈরতন্ত্রের ভাষা নয়। গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলুন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মোতাবেক কাজ করুন। নচেত জনগণই চিরকালের জন্য স্বৈরশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করবে!

রাজনীতির নেপথ্যে

বোরহান আহমেদ